এই সময়

* কথাসরিৎ *

রাজনীতির ভাষা এমন ভাবে তৈরি যাতে মিথ্যাকে সত্যি মনে হয়, হত্যাকে মনে হয় সম্মানের, এবং স্রেফ হাওয়াবাজিকেও নির্ভরযোগ্য লাগে।

— জর্জ অরওয়েল

অসুখ/১

ঈদে রাজ্য সরকার বাড়তি চার দিন ছুটি ঘোষণা করেছে বলে যে ভুয়ো খবর সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তাকে নিতান্তই নির্জলা রসিকতা হিসাবে উপেক্ষা করা বোধ হয় সমীচীন নয়। একাধিক কারণেই তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক এবং ঘটনাটির যথাযথ ও দ্রুত তদন্ত হওয়া জরুরি। প্রথমত, কোনও সরকারি পদাধিকারীর নাম, এমনিক সরকারি লোগো পর্যন্ত জাল করে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও ভুয়ো সংবাদ ছড়ানো বেআইনি। তা ছাড়া রাজ্যের একজন মন্ত্রী এর পিছনে যে সরকারকে হেয় করার রাজনৈতিক অভিসন্ধির আশঙ্কা করেছেন, তাকেও সম্পূর্ণ কষ্টকল্পনা হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে এমন একটি ভুয়ো খবর প্রচারের পিছনে সক্রিয়, তা প্রকাশ্যে আসা জরুরি এই কারণেও যে, ভুয়ো খবর বা ফেক নিউজ প্রচারের এই প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। অসুখটি দেশব্যাপী। আসাম ও মেঘালয়ের সাম্প্রতিক মর্মান্তিক ঘটনা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই 'ফেক নিউজ' সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে এক বিপজ্জনক সমস্যা হিসাবে উপস্থিত। সোশ্যাল মিডিয়াই প্রধানত ভুয়ো সংবাদের বাহক হওয়ায় এই বিপদ বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। কারণ, তা নিমেষের মধ্যে প্রায় সমগ্র বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তার উপর লাগাম পরানো সহজসাধ্য নয়। কাজেই রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই এই ব্যাধির প্রসার রোধে অধিকতর সচেতনতা ও উদ্যোগ কাম্য।

ব্যাধিটি গুরুতর নিঃসন্দেহে কিন্তু সে ব্যাধির উপশমের প্রচেষ্টা যাতে অন্য একটি ব্যাধিতে পরিণত না হয় সেটিও সুনিশ্চিত করা জরুরি। ফেক নিউজ রোধের ঘোষিত লক্ষ্যে সম্প্রতি জেলা স্তরে সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নজরদারির একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো তৈরির প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এক প্রকার নজরদারি যে জরুরি সে বিষয়ে বিতর্ক নেই, কিন্তু সমস্যা হল, কোনও গণমাধ্যমের উপরই সরকারি নজরদারির অতীত অভিজ্ঞতা এ দেশে সুখকর নয়, কারণ, প্রায়শই তা সরকারে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক হাতিয়ারে পর্যবসিত। কাজেই তেমন কোনও নজরদারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও তা যাতে নাগরিকদের মত প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকারটিকে খর্ব না করে তা সুনিশ্চিত করা কর্তব্য। বাস্তব এটাই যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের থেকেও ব্যাপকতর সামাজিক সচেতনতাই এ ব্যাধির উপশমে অধিকতর কার্যকর হতে পারে।

অসুখ/২

একাকিত্বের পরিসংখ্যান খুঁজে পাওয়া কঠিন, তবে রোগটি যে বাড়তির দিকে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রচুর। অথচ এমনটা হয়তো কাম্য ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ কী ভাবে একা একা বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে, সে প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সামাজিক কারণেই নয়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের নিরিখেও। কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা একা একা বাঁচতে বাধ্য হন, তাঁদের অধিকাংশই অন্যদের তুলনায় আগে মারা যান।

যোগাযোগ বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু এক সঙ্গে বাঁচার আনুষঙ্গিক উষ্ণতাগুলো যে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। একদা

কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের সব থেকে বড়ো চমক, ২০১৪-য় ভরাডুবির পরে জেডি(এস)-এর পুনরুত্থান

অতঃপর আঞ্চলিক দলগুলিই ভবিষ্যতের নিয়ন্তা?

মে মাসে হয়ে যাওয়া একাধিক উপনির্বাচন, রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন ও কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে আঞ্চলিক শক্তিগুলির ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধির ইঙ্গিত স্পষ্ট। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

অজিত নাইনান

মে মাসে দশ রাজ্যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হল। কর্নাটক বিধানসভার ভোট, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোট এবং কিছু রাজ্যে বিধানসভা ও লোকসভা উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট যে আগামী দিনে আঞ্চলিক দলগুলো ভারতীয় রাজনীতিতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে চলেছে।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কর্নাটকে, জনতা দল সেকুলার (জেডিএস) সহ অন্যান্যরা মিলে সর্বমোট ভোট পেয়েছিল ১৪.২৩ শতাংশ। এই ১৪.২৩ শতাংশ ভোটের মধ্যে ৭.৩৬ শতাংশ ভোট জেডিএস এর ঝুলিতে গিয়েছিল। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্রের শাসক দলের প্রায় ৭ শতাংশ ও কংগ্রেসের ৩ শতাংশের কাছাকাছি ভোট কমেছে। কিন্তু জেডিএস-এর প্রায় ১১ শতাংশ ভোট বেড়েছে। তাই কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে সবথেকে বড়ো চমক হল ২০১৪ সালের ভরাডুবির পর জেডিএস-এর উত্থান।

অর্থাৎ, আঞ্চলিক দলের শক্তি বৃদ্ধি। কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগের দিন একটি টেলিভিশন চ্যানেলে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যে আন্দাজ করেছিলেন অর্থাৎ এইচডি কুমারস্বামী কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন তা হুবহু মিলে গেল। ওই সাক্ষাৎকারে প্রধানত তিনি আঞ্চলিক দলগুলোর শক্তিবৃদ্ধির কথা বলছিলেন। কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে সেই কথা প্রমাণ হল যে, ভারতের অনেক রাজ্যের মতো ওই প্রদেশে আঞ্চলিক দল তাদের জমি ধরে রেখেছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, যদিও নির্বাচন কমিশনের খাতায়-কলমে তৃণমূল কংগ্রেস, বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি), জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দল (এনসিপি), সিপিআই(এম) এবং সিপিআই সর্বভারতীয় দলের তকমা পেয়েছে কিন্তু শক্তি ও প্রভাবের নিরিখে তারা কয়েকটা রাজ্যেই সীমিত। তারা বিজেপি ও কংগ্রেসের মতো বড়ো সর্বভারতীয় দল নয়।

বড়ো রাজ্যগুলোর দিকে তাকালে মে মাসের উপনির্বাচনগুলোতে উত্তরপ্রদেশের কৈরানা লোকসভা এবং নুরপুর বিধানসভা, বিহারের জোকিহাট বিধানসভা এবং মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা-গোন্ডিয়া লোকসভাতে আঞ্চলিক দলগুলো জয়লাভ করেছে। এই সমস্ত আসনে কেন্দ্রের শাসক দল বা তাদের সহযোগী দলের পরাজয় ঘটেছে। মহারাষ্ট্রের পালঘর বিধানসভাতেও কেন্দ্রের শাসক দলের হার হতে পারত যদি সেখানে বিজেপি-বিরোধী কোনও একটি দলকে, যেমন বহুজন বিকাশ আগাদি-কে (যারা বিজেপি এবং শিবসেনার পরে প্রায় পঁচিশ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছে এবং পঞ্চাশ হাজারের কম ব্যবধানে হেরেছে) ওই আসনে সিপিআই(এম) (যারা ৭১,৮৮৭ ভোট পেয়েছে) সমর্থন করত। কর্নাটকের রাজরাজেশ্বরীতে কংগ্রেস এবং কেরালার চেঙ্গান্নুরে সিপিআই(এম) তাদের বিধানসভা আসন ধরে রেখেছে। অপেক্ষাকৃত ছোটো রাজ্যগুলোর মধ্যে পাঞ্জাবের শাহকোটে বিজেপির জোটসঙ্গী অকালি দলের গড়ে কংগ্রেস জিতেছে আবার ঝাড়খণ্ডে আঞ্চলিক দল, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, গোমিয়া এবং সিল্লি বিধানসভা উপনির্বাচনে জিতেছে।

মে মাসের উপনির্বাচনগুলোর সঙ্গে মার্চ মাসে গোরক্ষপুর এবং ফুলপুর লোকসভা উপনির্বাচনকে ধরলে পরিষ্কার হচ্ছে যে, বিজেপি-বিরোধী শক্তি যদি এককাট্টা হয় তা হলে উত্তরপ্রদেশে কেন্দ্রের শাসক দলকে পরাস্ত করা সম্ভব। গোরক্ষপুর এবং ফুলপুর পূর্ব উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। অন্য দিকে নুরপুর বিধানসভা ও কৈরানা লোকসভা যথাক্রমে মধ্য ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। তাই ২০১৮ সালে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপির জন্য সুখকর বার্তা আসেনি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনের মধ্যে ৭১টি আসন পায় আর জোটসঙ্গী আপনা দল পায় ২টি আসন। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৪০৩ আসনের মধ্যে একাই ৩১২ আসন পায়। কিন্তু ২০১৪ এবং ২০১৭-র নির্বাচনে, প্রধান দুই আঞ্চলিক শক্তি সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টি কোনও প্রাক-নির্বাচনী জোট গড়েনি যেমনটা তারা শেষবার ১৯৯৩ সালে করেছিল। তাই সে দিক থেকে নুরপুর এবং কৈরানার ফল বিজেপির কাছে গভীর উদ্বেগের কারণ।

> আঞ্চলিক দলগুলোকে উপেক্ষা না করে এবং ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে কংগ্রেস যদি এখন থেকেই বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে এবং আম আদমি পার্টির সঙ্গে দিল্লি, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় প্রাক-নির্বাচনী জোট গড়ে, তা হলে তারা বিজেপিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে।

২০১৩ সালের মুজফ্‌ফর নগর সংঘর্ষের সময় পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষক সমাজে জাঠ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙনের সুযোগ বিজেপি নিয়েছিল। সমাজবাদী পার্টির কিছু কট্টরপন্থী মুসলিম নেতার অযাচিত বয়ানবাজির ফলে তৎকালীন সমাজবাদী পার্টি পরিচালিত উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল পরিস্থিতি। সেই অবস্থা থেকে কিন্তু বর্তমান কৈরানার নির্বাচন অনেকটা আলাদা। এখানে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি জিন্নাহ্‌-র ছবিকেন্দ্রিক যে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, তার থেকে নজর সরিয়ে আখের দামকে ইস্যু করেছিল রাষ্ট্রীয় লোক দল যারা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে বহু দিন ধরে নিজেদের গড় আগলে রেখেছে। এই নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি এবং কংগ্রেস সেখানে প্রার্থী না দিয়ে রাষ্ট্রীয় লোক দলকে সমর্থন জানায়। রাজনৈতিক জোটের সঙ্গে কৈরানায় জাঠ, মুসলিম এবং দলিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাতভ জাতের সামাজিক জোটও পরিলক্ষিত হল।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং সম্প্রতি মহেশতলা বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট যে বাংলার শাসক দলের জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন বাড়ছে। এবং ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে গত এক দশকে তৃণমূল কংগ্রেসের এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বিশেষ লক্ষণীয়। বিধানসভা উপনির্বাচনের ঠিক পরে কর্নাটকে, কংগ্রেস এখন থেকেই জেড়িএস-এর সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রাক-নির্বাচনী জোট ঘোষণা করেছে। আঞ্চলিক দলগুলোকে উপেক্ষা না করে এবং ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে কংগ্রেস যদি এখন থেকেই বহুজন সমাজ পার্টির সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে এবং আম আদমি পার্টির সঙ্গে দিল্লি, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় প্রাক-নির্বাচনী জোট গড়ে, তা হলে তারা বিজেপিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে। অন্য দিকে আগামী দিনে অনেকেই তাকিয়ে থাকবে যে, কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে এবং ওড়িশায় বিজু জনতা দলের সঙ্গে জোট গড়তে উদ্যোগী হবে কিনা।

বাংলায় তৃণমূলি রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং গরিব আর্থিক সমাজ থেকে উঠে এসেছে। এর সঙ্গে তৃণমূলি সিস্টেমে গ্রামীণ ও মফস্‌সল অঞ্চলে কিছু নব্য-ধনীর আবির্ভাব হয়েছে যারা তৃণমূলের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এই অংশ বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজি নয় অথচ স্বতন্ত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। অন্য দিকে তৃণমূল সিস্টেমে জেলা স্তরে এবং মন্ত্রিত্বের পর্যায়ে যতজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা-নেত্রী দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু এবং মহিলা, আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা সমাজের ওই সমস্ত মানুষের ততজন, এক-দু'জনকে বাদ দিলে কংগ্রেস আমলে তো বটেই, বাম আমলেও বিশেষ গুরুত্ব পেত না। সাম্প্রতিক অতীতে ২০০৬ সালের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ও ২০১৬ সালের তৃণমূল মন্ত্রিসভার সামাজিক পরিচিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট হয়।

এ হেন প্রেক্ষাপটে তৃণমূল বহু বামপন্থী ইস্যু নিয়ে লড়ছে যেমন খুচরো ব্যবসা-সহ ওষুধ, কৃষি, বিমা এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের বিরোধিতা, ব্যাঙ্কে সুদ কমলে রাস্তায় নামা, রাজ্যের দাবিগুলো নিয়ে কেন্দ্র-বিরোধী রাজনীতি, এসইজেড-এর বিরোধিতা, পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ার বিরোধিতা কিংবা হাল আমলে ঘটা করে মে দিবস পালন করা। এই সমস্ত ইস্যুকে ধরলে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে আজ একটা গড়পড়তা বামপন্থী পার্টির সঙ্গে তৃণমূলের রাজনৈতিক অনুশীলনের খুব একটা পার্থক্য পাওয়া যায় কি?

অন্য দিকে, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো (মূলত গ্রামীণ বিদ্যুৎ, রাস্তা এবং পরিশুদ্ধ পানীয় জল) গড়ার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে। গরিব এবং প্রান্তিক মানুষদের জন্য বিভিন্ন ভাতা ও ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে তারা মানুষের কাছে আরও জনপ্রিয় হচ্ছে। গত কয়েক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন ভোটের গতি-প্রকৃতি এবং বিশ্বাসযোগ্য ভোট সমীক্ষার ফলাফল সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। আজকের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের পপুলিস্ট রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং সরকার-কেন্দ্রিক পপুলিস্ট নীতি কিছু রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করছে, যখন নব-উদারবাদের দামামা বাজানো রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে হাত গোটাবার তাল করে চলছে এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সহ আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বড়ো কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেবার উপক্রম করছে। সে ক্ষেত্রে আজ তৃণমূলকে এক মধ্য-বামপন্থী পপুলিস্ট দল বলা চলে।

উপরন্তু এই নব্য-তৃণমূলের ভণ্ডামি অপেক্ষাকৃত কম। অন্তত বিজেপি এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরানো বামফ্রন্টি নেতৃত্বের থেকে। কারণ এক দিকে বামফ্রন্টের সব থেকে বড়ো শরিক তাদের পার্টিগত বিচার-বুদ্ধিতে বলবে, কংগ্রেস বৃহৎ পুঁজিপতি-ভূস্বামীদের দল (অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রেণি-শত্রুদের দল), আবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো কৌশলের দোহাই দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলায় নির্বাচনী আঁতাতের পক্ষে থাকবে। অন্য দিকে নন্দীগ্রাম কাণ্ডের প্রধান কাণ্ডারীর অভিযোগে অভিযুক্ত এক প্রাক্তন সিপিআই(এম) নেতা বা তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব যিনি চিটফান্ড কাণ্ড এবং সম্প্রতি আরও একটি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁদের বিজেপি সাদরে গ্রহণ করবে! তৃণমূল একটি রেজিমেন্টেড দল নয় কিন্তু দলটির মধ্যে একটা সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি আছে। ভদ্রসমাজের অনেকেই হয়তো তাতে নাক সিঁটকোবেন কিন্তু তাতে তৃণমূল স্তরের মানুষদের কিছু যায় আসে না। যাঁরা গ্রামেগঞ্জে ঘোরেন এবং শহরের বস্তিবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা বেমালুম জানেন তৃণমূল স্তরের মানুষ কেন নির্দ্বিধায় তৃণমূলকে ভোট দেন।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক